গল্প পঞ্চাশৎ

৫০ জন নারী গল্পকারের ৫০টি গল্প

ভূমিকা
সেলিনা হোসেন

সম্পাদনা
নাহার তৃণা

গল্প পঞ্চাশৎ : ৫০ জন নারী গল্পকারের ৫০টি গল্প
ভূমিকা : সেলিনা হোসেন
সম্পাদনা : নাহার তৃণা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সম্পাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৭০০ টাকা

Golpa Ponchashot (50 stories by 50 women storytellers) preface by Selina Hossain edited by Nahar Trina Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: September 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 700 Taka Rs: 700 US 35 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-8-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

পৃথিবীর সকল রণাঙ্গনের নারীদের প্রতি

ভূমিকা

নাহার তৃণা সম্পাদিত গ্রন্থ 'গল্প পঞ্চাশৎ' একটি চমৎকার সম্পাদনাকর্ম। প্রবাসে বাস করে সংশ্লিষ্টদের এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। এপার-ওপার নয়, বরং বলা ভালো অপার বাংলার লেখকদের সম্মিলিত চেষ্টার সৌরভে পুষ্পিত হয়েছে গল্পের অন্তরঙ্গ আলো।

বাংলা ভাষার নারী লেখকদের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই সংকলন। পঞ্চাশটি গল্প এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাভাষী নারী লেখকরা নিজেদের অবস্থানে থেকে গল্প রচনা করেছেন সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আপন হৃদয়ের কুঞ্জবনে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ সম্পাদনা বিভিন্ন জায়গা থেকে গল্প সংগ্রহ করার। প্রবাসের নারী লেখক, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের নারী লেখকদের গল্প এতে সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্য জনজীবনের প্রতিচ্ছবি। রূপায়িত হয় বেঁচে থাকার গল্প। এই বেঁচে থাকার নানা মাত্রা আছে, যে মাত্রা ধারণ করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় স্বপ্নের ভুবনে। ব্যক্তিজীবনের নানা সংকট মানুষের বেঁচে থাকার জমিনকে এলোপাথাড়ি করে দেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিজীবন নানা অনুষঙ্গে ভরে থাকে। গল্পকাররা সেখান থেকে তুলে নেন কাহিনির সূত্র। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রেমের সম্পর্ক, সামাজিকতার নানাবিধ জটিলতা, নারী-পুরুষের সম্পর্কের বৈষম্য ইত্যাদি লেখকের কাহিনিতে উঠে আসে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব লেখকই এই মাত্রা ধরে জীবনের খুঁটিনাটি গল্পের আঙ্গিকে ভরিয়ে তোলেন। যিনি অনুভবের পূর্ণতায়, চিন্তার মগ্নতায় গভীরভাবে কাজটি করতে পারেন তিনি দিগ্বিজয়ী হন। পাঠক সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর লেখা মননশীলতায় ধারণ করেন। যদিও এটি নারী লেখক রচিত গল্প সংকলন, তারপরও আমি মনে করি সাহিত্যে নারী-পুরুষের আলাদা চিহ্ন নেই। লেখক হিসেবে নারী-পুরুষ সমগোত্রের। শুধু পুরুষ লেখক হওয়ার কারণে ইতিহাস পুরুষকে ছাড় দেয় না। দুর্বল লেখা হলে তা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়। সেজন্য রচনার ধীশক্তি অর্জন করা লেখকের জন্য জরুরি।

আমি তৃণাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সেলিনা হোসেন
কথাসাহিত্যিক

সম্পাদকের কথা

পঞ্চাশজন নারী লেখকের গল্পের সংকলনটি দেরিতে হলেও মলাটবন্দি বই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে পঞ্চাশজন নারী লেখকের গল্প নিয়ে একটি গল্প সংকলনের পরিকল্পনা করেন বইয়ের হাট ইবুক-পাবলিকেশন্স ও পড়ুয়ার সম্পাদক রিটন খান। সংকলন সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি আমাকে দেন। প্রথমে ভড়কে গেলেও তাঁর সহৃদয় সহযোগিতায় কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

কাজটি করতে গিয়ে প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজন কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে যোগাযোগের সৌভাগ্য হয়। এঁরা শুধু বড়মাপের লেখক নন আন্তরিকতায় ভরপুর একেকজন আলোকিত মানুষ। এই মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হওয়াটা আমার কাছে শুধুমাত্র সৌভাগ্যের নয়, একই সঙ্গে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বিশেষ। শ্রদ্ধেয় অমর মিত্র, কুলদা রায়, হারুন রশীদ, মোজাফফর হোসেন, নাহার মনিকা, পাপড়ি রহমান, কল্যাণী রমা এক্ষেত্রে সাঁকোর মতো কাজ করেছেন। এঁরা আমাকে লেখা সংগ্রহের জন্য উল্লেখিত শ্রদ্ধেয়া সাহিত্যিকদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুলুকসন্ধান দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসায় স্মরণ করছি।

শ্রদ্ধেয়া সেলিনা হোসেন আপার সঙ্গে যোগাযোগের পর থেকে তাঁকে নিরন্তর জ্বালিয়েছি। শতেক ব্যস্ততার ভেতর তিনি সংকলনের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। লেখকক্রম সাজানোসহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের। ব্যক্তি সেলিনা হোসেনের সঙ্গে সংকলনের সূত্রে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। সে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা অতুলনীয়, তাঁর মধ্যে আমি স্নেহশীলা এক মায়ের স্পর্শ পেয়েছি। যিনি শতেক বায়নাতে একটুও বিরক্ত হননি। যখন যেটার জন্য আবদার করেছি, সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন—পেয়ে যাবে, করে দেব। দিয়েছেনও। হাতে লিখে ভূমিকা পাঠিয়েছেন আপা। সেলিনা হোসেনের স্নেহ এবং হাতের লেখা পাওয়ার সৌভাগ্য একটি উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় প্রাপ্তি।

আরেক প্রিয় লেখক বাণী বসু। কিন্তু কখনো কথা হয়নি। লেখালেখির মাধ্যমেই তাঁকে জানা, ছবি দেখে চেনা। ছবি দেখে ভাবতাম, মানুষটা বুঝি খুব রাশভারী হবেন। ফোনে কথা বলে একদমই সেরকম মনে হয়নি। আলাপান্তরে তাঁকে যখন জানাই—সেলিনা হোসেন, বাণী বসু এবং নবনীতা দেবসেন, এই

তিনকন্যা আমার ভীষণ প্রিয়। দেশ থেকে যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন যে নয়খানা বই সঙ্গে এনেছিলাম তার মধ্যে সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' আর আপনার 'গান্ধর্বী' ছিল দিদি। শুনে বাচ্চাদের মতো খিলখিল করে হেসে বললেন, তাই বুঝি! তাঁকে বললাম, দিদি, আপনার 'আসন' গল্পটি দিন আমাদের। হেসে বললেন, ওটা বহু সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে, তার চেয়ে 'মাতৃদায়' নিন, ভালো গল্প। দিদি ই-মেইল এড্রেস দিলেন। এও বললেন, যদি নতুন গল্প চাই তবে তিনি লিখে লিখে হোয়াটসঅ্যাপে এক পাতা করে পাঠাবেন। অত কষ্ট দিতে মন সায় দেয়নি। পুরনো গল্পই সই।

খুব অবাক করেছেন শাহীন আখতার। ওঁর ই-মেইল এড্রেস পেয়ে যোগাযোগ করি এবং সংকলনের কথা জানিয়ে একটি গল্প চাই। মেইল পাঠানোর মিনিট পনেরো বাদেই শাহীন আখতার আপা, আমার মতো সম্পূর্ণ অচেনা একজনকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জানান শিগগিরই তিনি গল্প পাঠাবেন। তাঁর কাছ থেকে এত দ্রুত সাড়া পেয়ে সত্যিই অবাক হয়েছি। আপার পরিবারের একজন সদস্য তখন খুব অসুস্থ ছিলেন, তা সত্ত্বেও যখন মেইল করেছি দ্রুত সাড়া দিয়েছেন, এই সহৃদয়তা মনে রাখার মতো।

জয়া মিত্র দিদির কাছ থেকেও একই রকম ব্যবহার পেয়েছি। আমার মতো নবীন একজনকে তাঁর চেনার কথা নয়। কিন্তু যখন অমর মিত্রদার নাম উল্লেখ করে তাঁর কাছে সংকলনের জন্য গল্প চেয়েছি, কী ভীষণ আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দিয়েছেন তিনি! একই অভিজ্ঞতা পূরবী বসু দিদির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। অন্যদের তুলনায় পূরবীদির সঙ্গে অনেক দেরিতে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু তিনি সেটিকে একেবারেই ধর্তব্যে নেননি। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে যখন জানাই যে এত ভয়াবহ একটা মারি পার করছি অথচ সংগৃহীত গল্পে বিষয়টি সেভাবে আসেনি। তিনি জানান, চলতি ঘটনা নিয়ে লেখায় মোটেও অভ্যস্ত নন, হলে হয়তো লিখতেন। অবাক করে দিয়ে দিদি যে গল্পটি আমাদের দিলেন তার মূল বিষয়বস্তু কোভিড-১৯! অমূল্য এই আন্তরিকতা। আমাদের একান্ত আবদারের কাছে নতিস্বীকার করে আপাদমস্তক কবি ফেরদৌস নাহার একটি গল্প দিয়েছেন। শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সংকলনে দেবার জন্যে গল্পটির পরিমার্জনায় সময় দিয়েছেন। এই প্রথমবারের মতো কোনো গ্রন্থে ফেরদৌস নাহারের গল্প প্রকাশের সুযোগ ঘটল। নিঃসন্দেহে তাঁর গল্প এই সংকলনের একটি স্মরণীয় সংযোজন। আনোয়ারা সৈয়দ হকের পক্ষ থেকে তাঁর সন্তান দ্বিতীয় সৈয়দ হক গল্প পাঠিয়েছেন। মাসুদা ভাট্টিও চাওয়ামাত্র গল্প বিষয়ে সাড়া দিয়েছেন। কবি শামীম আজাদ, কথাসাহিত্যিক পাপড়ি রহমানের কাছ থেকেও পেয়েছি ত্বরিত এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সাড়া।

এমন সব যূথবদ্ধ আন্তরিকতা-ভালোবাসার কারণে সম্ভব হলো গল্প সংকলনটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া। এক্ষেত্রে রিটন খানের সহৃদয়তার কথা না বললেই নয়। সেলিনা হোসেন, বাণী বসুর লেখা সংগ্রহ সম্ভব হলেও কপিরাইট ইস্যুর কারণে

নবনীতা দেবসেনের গল্প সংগ্রহ করতে না পারার ব্যক্তিগত একটি আফসোস ছিল। রিটন খান সেটি জ্ঞাত ছিলেন। নবনীতা দেবসেনের গল্পের কপিরাইট কিনে নিয়ে তিনি শুধু আমাকে অবাক করেননি, সংকলনটিকেও পূর্ণতা দিয়েছেন।

মোটকথা, এই সংকলনে অংশ নেওয়া সবার কাছ থেকে সহৃদয় সাড়া পেয়ে আপ্লুত হয়েছি। এমন মন ভালো করে দেবার মতো প্রচুর গল্প আছে, যা এই সংকলনের কারণে আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ঝাঁপিতে জমা হয়েছে। সেসব আনন্দস্মৃতি মুঠোবন্দি করে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা পঞ্চাশজন লেখকের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো 'গল্প পঞ্চাশৎ'।

একটা সময় ছিল যখন নারীর লেখালেখি নিয়ে ঠাট্টা করা হতো। আড়েঠাড়ে বলা হতো আরশোলার পাখি হওয়ার শখ! বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস নারী প্রধান। কাহিনির আখ্যানে নারী চরিত্রগুলো পুরুষ চরিত্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে চারিত্রিক দৃঢ়তা আর আত্মমর্যাদা নিয়ে। অথচ তাঁর বিখ্যাত 'কমলাকান্তের দপ্তর' উপন্যাসের কমলাকান্তের মুখে গুঁজে দিয়েছেন নারীকে হেয় করে এমন সংলাপ—'নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অস্টিন উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।'

সময় উজিয়ে আজকের দিনেও জেন অস্টিন, কিংবা মেরি ফায়ারফক্স সামারভিলের অর্জন অস্বীকারের উপায় নেই, বরং তা এখনও চর্চার বিষয়। বিশেষত, জেন অস্টিনের সাহিত্য সৃষ্টিকে অগ্রাহ্যের উপায় ২০২০-এও তৈরি হয়নি। নারীকে হেয় করার মানসিকতার ইতিহাস সুপ্রাচীন। আজও তার রেশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে। গোপন গহিনে আজও নারীর সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব দেখা যায়। আধুনিকমনস্ক অনেকেই এখনও নারীর সাহিত্যপ্রতিভা বা ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা পোষণের মান্ধাতা মানসিকতার ভাসান দিতে অক্ষম।

মেধাভিত্তিক ক্ষেত্রে নারীর জন্য আলাদা কোনো সিলেবাস তৈরি হয় না। নারী-পুরুষ দুপক্ষকেই একই সিলেবাসে মেধা যাচাইয়ের পরীক্ষায় নিজেদের পারদর্শিতা দেখাতে হয়। নারীত্ব নারীর জন্মগত পরিচয়। এই পরিচয় নারীকে আজন্ম বহন করে চলতে হয়, এবং এই পরিচয় বহনে নারীর নিজস্ব কোনো আক্ষেপ থাকে না। তবুও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব খুঁচিয়ে একটা বির্তক সৃষ্টির ছুতো খুঁজে বেড়ায়।

নারী-পুরুষ দুপক্ষের পরিচয়ে লিঙ্গভেদ থাকলেও চরিত্র এবং জাতিভেদ নেই। লেখকের কোনো লিঙ্গ হয় না। সাহিত্যের মান উঁচু-নিচু হওয়ার পেছনে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই। উঁচুমানের সাহিত্য যিনিই লেখুন না কেন, তিনি কোন লিঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটার তোয়াক্কা না করেই ইতিহাস সেই সৃষ্টিকে ধারণ করে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, পুরুষের তুলনায় নারীদের সাহিত্যভুবনে টিকে থাকাটা একটা চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও

নারীকেই সমাজ, সংসারের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হয় পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। জীবনের জন্য, জীবনের প্রয়োজনেই শিল্পসাহিত্য, আর তার বয়ান একা পুরুষের যেমন নয়, নারীরও নয়। বরং নারী-পুরুষ পাশাপাশি সৃষ্টি করে যান তাঁদের যৌথ অভিজ্ঞতার অনন্ত কথোপকথন।

সম্পাদনার কাজে একজন নবীনের ওপর রাখা আস্থা কতটা সুচারুভাবে পালিত হয়েছে সেটি নির্ভর করবে পাঠক সংকলনটিকে কতটা সাদরে নিলেন তার ওপর। এমন একটি সংকলনের কাজে আমাকে যুক্ত করার জন্য রিটন খানের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ভালোবাসা। একই সঙ্গে লেখকবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ভালোবাসা জানাচ্ছি। এটি আমার প্রথম সম্পাদিত কাজ। কাজটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখায় আন্তরিকতার কমতি ছিল না। তারপরও হয়তো ভুলত্রুটি রয়ে গেল। সেগুলো ক্ষমার চোখে দেখবার আবেদন রইল। 'গল্প পঞ্চাশৎ' পাঠকমনে জায়গা করে নেবে এটাই সর্বোচ্চ চাওয়া।

নাহার তৃণা
ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র

সূ চি প ত্র

শাখামৃগ বৃন্দ ও নালায়েক যুবকটা • বেগম জাহান আরা ১৫
লক্ষ্মণের নরকদর্শন • নবনীতা দেব সেন ২৩
মাতৃদায় • বাণী বসু ২৮
মৃত্যুর নীলপদ্ম • সেলিনা হোসেন ৩৮
শালিক উড়ে গেলে • পূরবী বসু ৪৬
নাবিলা • আনোয়ারা সৈয়দ হক ৫৬
আছি • সুচিত্রা ভট্টাচার্য ৬৬
বেদি আর বুড়ি • জয়া মিত্র ৭৯
রথসচাইল্ডের জিরাফ • ইন্দ্রাণী দত্ত ৯১
উইলিয়ামের গল্প • শামীম আজাদ ৯৭
অন্য জীবন • সুরঞ্জনা মায়া ১০২
পোঁছ • গীতা দাস ১০৮
গল্লামারী ব্রিজের নিচে • লুতফুন নাহার লতা ১১৩
মেকআপ বক্স • শাহীন আখতার ১২০
পরজনমে হইয়ো রাধা • দোলা সেন ১২৮
সীমানা • প্রতিভা সরকার ১৩১
মাংসাশী • ফেরদৌস নাহার ১৩৬
জনক • নাসরীন জাহান ১৪৩
ক্রফোর আতোয়ান এবং জয়তুনের শোলক • পারভীন সুলতানা ১৫৪
হাওয়াকলের গাড়ি • পাপড়ি রহমান ১৬৩
বৃক্ষপুরুষ • যশোধরা রায়চৌধুরী ১৭২
খোঁজ • রুখসানা কাজল ১৮০
সাগরলিনা • সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত ১৯২
জাহ্নবীর জল • কাজী লাবণ্য ২০১
পিক্সি-ডাস্ট • কল্যাণী রমা ২০৬

মাৎস্য • রঞ্জনা ব্যানার্জী ২২০
রঙ্গমঞ্চ অধ্যয়ন পাঠশালা • শাহনাজ নাসরীন ২২৫
মধুমিতা রায় • মৌসুমী কাদের ২৩০
বাক্স • নাহার মনিকা ২৩৪
মৃতেরা শব্দ করে না • শাহনাজ মুন্নী ২৩৯
নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু • রুমা মোদক ২৪৬
অতল ভ্রমণে • মেঘ অদিতি ২৫৫
ইয়াকুবমামার ভারতবর্ষ • তৃষ্ণা বসাক ২৬১
ইলিশ • সুমী সিকানদার ২৬৬
আমাদের বড়দিন • তন্বী হালদার ২৬৯
এক জীবন বহু গল্প • মাসুদা ভাট্টি ২৭৮
রক্তজবা, বারবারা ও কালো ফুলদানি • নাহিদা আশরাফী ২৮৬
বাইশ বছর পরে কেনা শাড়ি • মনিজা রহমান ২৯১
ঝরনাপাড়ের বাড়ি • মল্লিকা ধর ২৯৮
গোল্লাছুট • সাগুফতা শারমীন তানিয়া ৩০৭
লিলিয়ানা ও একটি ঘরবউনি সাপ • সাদিয়া সুলতানা ৩১১
লেটার বক্স ও হলুদ চাঁদ • স্মৃতি ভদ্র ৩১৭
প্রেয়সী • নাহিদা নাহিদ ৩৩২
আমি অপার হয়ে বসে আছি • সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ৩৩৯
আগুনেও পোড়ে না প্রেম • ফাহরিয়াল রহমান ৩৪৮
মুখোশের দোকান ও আয়নাওয়ালা • প্রজ্ঞা মৌসুমী ৩৫২
কর্পূর নিবাস • নিবেদিতা আইচ ৩৫৫
অন্য জানালা • দেবদ্যুতি রায় ৩৬২
বাথটাবে ঘুমিয়ে পড়ার আগে • ফারজানা শারমীন সুরভী ৩৬৮
এক কামরার ঘর • মাহরীন ফেরদৌস ৩৭৩
লেখক পরিচিতি ৩৭৯

শাখামৃগ বৃন্দ ও নালায়েক যুবকটা

বেগম জাহান আরা

হাঁসফাঁস করে বিছানায় উঠে বসে তমাল। শালা স্বপ্নের বাচ্চা। গুষ্টি বেচি তোর। আর কোনো টপিক পেলি না দেখানোর! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সাইড টেবিলে রাখা বোতল মুখে ধরে পানি খেল খানিক। তাড়াতাড়ি করার জন্যই বোধহয় নাক মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কিছু পানি। টিসুর জন্যে হাত বাড়াল। পেল না। তাই তো, পড়ার টেবিলে রেখেছে। মানে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে আনতে হবে। ধুর! তার চেয়ে ভালো লুঙ্গির খুঁট।

নাক চোখ মুছে তমাল আবার শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম পালিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ঘরের ভেতর ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী আপদ! অবাক হয় তমাল। ভাবে, তার ঘরটাই এত পছন্দ হতে হবে কেন ওদের? তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে, থুক্কু, উপহার দিয়ে ঢাকায় জয়েন করার ব্যবস্থা করেছে। উপহারের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে গ্রামের সামান্য যা কিছু ছিল, তা বিক্রি করতে হয়েছে। পুকুর, ভিটে, আম কাঁঠালের গাছ, মায় দুধেল গাইটা পর্যন্ত। ভিটের ওপর শোয়ার কুঁড়েঘরটা শুধু আছে। বাবা থাকেন। বড় দুই ভাই পাশের গ্রামে বিয়ে করে সেখানেই ঘর বসত করে। তার এই ছোট্ট ঘরে সে তাদের চেয়ে ভালো আছে। কারণ, তার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন ছাড়া জীবনের মূল্য কী? ভাইদের স্বপ্ন নেই। সে সংগ্রাম করে উন্নত জীবনের জন্য। ভাইয়েরা বলদের মতো খাটে, গ্রামের মাতব্বর হওয়ার জন্য। ওরা কৃষি খামারের মালিক হওয়ার কথাও ভাবে না।

বৃত্তি পেয়ে পেয়ে পড়েছে তমাল। অঙ্কের পণ্ডিত স্যার আর বাংলা ম্যাডামের উৎসাহ না পেলে তাকেও জমি জিরেত দেখে খেতে হতো। করপোরেট অফিসে চাকরিটাও স্যার এবং ম্যাডামের জন্যই হয়েছে। তারপরেও উপহার দিতে হয়েছে। মনের ইচ্ছে, বছর দুয়েকের মধ্যে গ্রামের পাট চুকিয়ে দিয়ে গাজীপুরে নিয়ে আসবে বাবাকে। তারপর বিয়ে, সংসার, ছেলেপুলে। বড় বাড়ি হবে। বাবার জন্য কাজের লোক রেখে দেবে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। বিদেশ পাঠানো। সময় তো পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে। এক বছর কোথা দিয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি।

আউ! আঁতকে ওঠে তমাল। আবার ওদের চলাফেরার শব্দ। মনে হলো, লাফিয়ে পড়ল কেউ বিছানায়। একটা পাকাবাড়ির এক রুমে সাবলেট থাকে। ঘর লাগোয়া ছোট্ট বারান্দার কোণায় চাল ডাল ফুটিয়ে নেয়। ভালোর মধ্যে একটা

অ্যাটাচড বাথরুম আছে। যদিও চিপা, তবু স্বাধীনতা আছে। ঘুম তো গেছেই, বাথরুমে যেতেও ভয় করছে। রীতিমতো ঘামছে তমাল।

কিন্তু এ কী! এটা তো তার ঘর মনে হচ্ছে না। তার পাড়াতুতো চাচার সঙ্গে একদিন পুরান ঢাকার দৈনিক এক পত্রিকার অফিসে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে সেই রকম মিটিং ঘর। ভালো করে তাকিয়ে দেখে, দেয়াল সরে সরে বড় হচ্ছে ঘরটা। শাখা মৃগরা তো প্রথম থেকেই ছিল। এখন মানুষেরাও এসে বসছে। ডেকোরেটরের সস্তা প্লাস্টিকের ছাইরঙা চেয়ার পাতা সারা ঘরে।

তমাল চিনতে চেষ্টা করে মানুষগুলোকে। বিশাল ঢাকা নগরে এক বছরে কাউকেই চেনা হয়নি। বন্ধুত্ব হয়নি কারও সঙ্গে। শুধু মুখ চেনাচিনি। দেখা হলে, 'হাই হ্যালো'। একটু হাসি। ব্যস। তবু কিছু কিছু মানুষকে চিনতে পারল। প্রায় রোজই পত্রিকায় ছবি আসে ওদের। ওরা কেউ কেউ পত্রিকার মালিক। কেউ মন্ত্রী। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সাংবাদিক, কেউ নেতা। বাকিরা কিছু নাতি নেতা, ছাতি নেতা, জুতো নেতা, ঝাঁটা নেতা, চাটা নেতাকেও দেখা গেল। ওরে বাবা, তার ধনী বসকেও দেখা যাচ্ছে। অফিসের ফোন অপারেটর মিনুকেও দেখা যাচ্ছে বেশ সেজেগুজে এসেছে। বস আজকাল মিনুকে বেশ পছন্দ করছেন। ফিসফাস হয় এই নিয়ে অফিসে।

টেবিল চাপড়ে কিছু ঘোষণা দিচ্ছে এক মস্ত স্বাস্থ্যবান শাখামৃগ। আরেব্বাহ! সে তো দিব্যি মানুষের ভাষায় কথা বলছে। স্বরটা একটু নেকো। সাজ পোশাক বনেদি মানুষের মতো। হাফ হাতা রাজশাহী সিল্কের শার্ট আর পায়জামার সঙ্গে ঘাড়ে ঝোলানো একটা চাদর। পায়ে জরির হালকা কাজ করা চপ্পল। ডান হাতে পান্না বসানো রুপোর আংটি। ঢল ঢল করছে। খুলে না গেলে হয়! বেশ অভিজাত লাগছে।

—আজ মিটিং ডেকেছি বিশেষ বিপদে পড়ে। আপনারা এসেছেন, ধন্যবাদ জানাই। কিছুদিন ধরে আমরা খেয়াল করছি, মানুষ অকারণে আমাদেরকে নির্যাতন করছে। কদিন আগে একটা এলাকায় বিষ প্রয়োগে আমাদের প্রায় পঞ্চাশজন সদস্যকে হত্যা করেছে তারা নির্মমভাবে। সেটা আবার পত্রিকায় ফলাও করে ছাপানো হয়েছে। কী ধৃষ্টতা! তাদের মধ্যে আমার মেয়েটার নিরপরাধ জামাইও ছিল। আহা বাছা! কতই আর বয়স হবে! হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করে সরদার শাখামৃগ।

দেখাদেখি অন্য অনেক শাখামৃগ দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কী অবাক, মানুষেরাও কাঁদছে। তাদের কাঁদার কারণ কী? তমালের চোখে পানি নেই। কান্নাও আসছে না।

পাশ থেকে এক শাখামৃগ গায়ে ধাক্কা দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, আপনি কাঁদছেন না কেন?

—আমার কান্না আসছে না।

—না আসলেও দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নার ভান করেন।

—চোখে তো পানি আসবে না।

—নিকুচি করি সৎ মানুষের। চোখে অনেকেরই পানি নেই। তবু নেতাকে সঙ্গ দিচ্ছে। দেখছেন না?

—কান্নার আবার সঙ্গ দিতে হবে কেন?

—এই চুপ, চুপ।

—ভাইসব, নেতার গলা শোনা গেল আবার, সংক্ষিপ্ত সভায় বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুধু কয়েকটা কথা বলার জন্যই এসেছি। মনে রাখতে হবে, আমরা মানুষ নই, শাখামৃগ। কর্ণাটকে হাম্পির কিষ্কিন্ধার পুণ্যভূমিতে আমাদের পূর্বপুরুষের বাস। পুণ্যতোয়া তুঙ্গাভদ্রানদীর লালনে চিরসবুজ দণ্ডকারণ্যের গল্প এখনও প্রজন্মের মুখে মুখে। বাগদাদি সৈয়দের যেমন আলাদা বংশমর্যাদা আছে, কিষ্কিন্ধার আদি বাসিন্দা হিসেবে আমাদেরও আছে তেমনি বংশমর্যাদা। বাপদাদার কাছে শুনেছি, আমরা চিরবরেণ্য সুগ্রীবের বংশধর। আমরা মিছে কথা বলি না। ঘুষ খাই না। পুকুর চুরি করি না। মিছে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিই না। করোনার মতো ঘাতক রোগ নিয়ে ব্যবসা করি না। পরের দেশে টাকা পাচার করি না। আমাদের সমাজে ধর্ষণ নেই। মানুষ আমাদের একটাই দোষ ধরে, আমরা ফ্রি সেক্সে বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষেরাও কম যায় না। ওরা বলে না, আমরা বলি। ওরা ফ্রি সেক্সের জন্য খুনোখুনি করে। আমরা করি না। আমরা আপোসে বিশ্বাসী। যাক সে কথা।

বিচিত্র ধ্বনিতে হাসির রোল শোনা গেল। বয়সী শাখামৃগিরা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল লজ্জায়। অল্প বয়সী পুরুষ-মহিলা শাখামৃগ-মৃগিরা তাদের টাইট ছেঁড়াফাটা জিন্সের প্যান্টের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে গেল। সরু সরু লাঠির মতো পা হওয়ার জন্য কারও কারও পা বের হয়ে গেছে ছেঁড়া জায়গা দিয়ে। বেচারারা, মানুষের মতো করে ছেঁড়াফাঁসা ফুটো কাটা জিন্সের প্যান্ট সামলাতে পারে না এখনও। তবু নিজেরা নিজেরাই টেনেটুনে ঠিক করে নিল স্মার্ট যারা। শাখামৃগিরা কেউ ওড়না পরে না। বুকের মাপের চেয়ে ছোট কাপের ব্রা পরেছে সিনেমার সেক্সি নর্তকীদের মতো। সেগুলো দেখে নিল একবার।

নেতা বলে যাচ্ছেন, তবে খাওয়াদাওয়াটা জোটাতে হয় এখান ওখান থেকে। বনজঙ্গলে বিধাতা আমাদের জন্য প্রচুর খাবার দিয়ে রেখেছেন। তবু কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে মানুষের ঘরে ঢুকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। কী আর এমন সেটা! এই রুটি বিস্কুট বাদাম কলা এই সব। সেই জন্য বিষ দিয়ে আমাদেরকে হত্যা করা হবে? কত শিশু মা-বাবা হারাল। এতিম বাচ্চাগুলোর কী হবে এখন?

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সরদার। এবার হেঁচকি উঠে যায়।

হইচই করে কেঁদে ওঠে সভায় উপস্থিত সবাই। এবারেও তমাল কাঁদে না। পাশের শাখামৃগটা বলল, সমস্যা কোথায় আপনার? কাঁদছেন না কেন এখনও?

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—মানুষের বুদ্ধি যে আমাদের চেয়ে কম, সেটা জানি। কিন্তু আপনার মাথায় তো দেখি মুরগির মগজও নেই। শুরু করেন। কাঁদেন। দল করতেও শেখেননি?

—দল করে কী হবে?

—এখনও বোঝেননি? আসলে মুরগিও না আপনি। এ তো দেখি কেঁচো প্রজাতির। বড়শিতে গেঁথে নেওয়ার পরেও বুঝতে পারেন না যে গেঁথে গেছেন। আরে ভাই, দল করলে গাছেরটা খেতে পারবেন, তলারটাও পারবেন।

—আমি দল করতে চাই না।

—এমন কথা তো আগে শুনিনি কোনো দিন। দলে ভেঁড়ার জন্য নাতি নেতাদের পায়ের জুতো পালিশ করে দেয় মানুষ, আর আপনি বলছেন দল করতে চান না।

—না, চাই না।

—কোন ভাগাড় থেকে এসেছেন জনাব?

—আমি ঢাকায় থাকি।

—কোন গুরু আপনাকে দল করতে না করেছে?

—সে জন্য গুরু লাগে নাকি?

—বড়ই সেয়ানা দেখি। চটকানা খাননি তো!

—চটকানা খাব কেন?

—খিংটক পালোয়ান থাকলে এতক্ষণে আপনার ভোঁতা মুখ থোঁতা করে দিত।

—পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছেন আপনি। জানেন আমি কে?

—কুখ্যাত ভাগাড়ের, অখ্যাত গাঁয়ের, কেঁচোপাড়ার, গুবরে পোকা আপনি।

এবার রেগে যায় তমাল। সত্যি কথাটা বলি তাহলে। আমার একজন রাশিয়া ফেরতা কাকু আছেন। তিনি আমাকে 'না' করেছেন দল করতে। বলেছেন, সমাজতন্ত্রের মতো বিশাল দল, বিশাল আদর্শের ভান করেও টেকানো যায়নি। ভেঙে গেল অত বড় দেশ। আর আমাদের দল তো কোনো পদেরই না। কোনো আদর্শই নেই। ভেতরে ভেতরে শুধু কোন্দল। শুধু খাই খাই। কেন খাই তাও জানে না।

—আপনার কাকু একটা আস্ত গাড়ল।

—কী যা তা বলেন? ঐ তো নেতার পাশে বসে আছেন, ঐ যে মস্ত মোটামতো, কাগজে ছবি দেখেন না রোজ রোজ, ওই মন্ত্রীই আমার সেই কাকু।

শাখামৃগটা নিজের হাতে দুই কান ধরে জিভ কাটল। বলল, থুক্কু ভাই। আমার কথাটা আপনার মন্ত্রী কাকুকে বলবেন না প্লিজ।

—ও কিছু না। অনেক খারাপ খারাপ গালি ওদের সহ্য করতে হয়। আমার সামনেই কত লোকে অকথ্য গালি দেয়। মুখে মুখে জুতো পেটা করে। সাধে কি পরিচয় দিই না?